গুহাচিত্র

ভারতবর্ষে আর্যজাতির আগমনের পূর্বে দ্রাবিড় জাতির আগমন ঘটে ; এই দ্রাবিড়দের পূর্বে যারা ভারতবর্ষের অধিবাসী ছিল তাদের পৌরাণিক নাম 'নিষাদ'। আধুনিক কোল, সাঁওতাল, হো, ওঁরাও প্রভৃতি জাতি এই নিষাদ জাতির বংশধর।

অনুমান পনর হাজার বৎসর পূর্বেও এই 'নিষাদ'গণ ভারতবর্ষের দক্ষিণ অঞ্চলে বসবাস করেছে ; তাদের তৈরি বহু বহু পাথরের অস্ত্র শস্ত্র পাওয়া গেছে বিন্ধ্যাগিরির বহু গুহায়। তখনো মানুষ শস্যের ব্যবহার জানে নি, পশু মাংস অর্ধ দগ্ধ করে সেই খেয়ে জীবন ধারণ করত ; ঘর বাড়ি তৈরি করতে জানে নি, পার্বত্য গুহার আশ্রয়ে বর্ষাকালে দলবেঁধে কাটিয়ে দিত, আর অন্যান্য কালে তরুতলে কিংবা পাহাড়ের গায়ে ; পাত্রাদি তৈরি করতে জানত না, নদী আর ঝরণার কাছাকাছি জায়গায় থাকত যেন পিপাসার জল হাতের কাছে পায় ; বস্ত্র বয়ন জানত না, পশুর চর্মে শীত নিবারণ করত। পাথর ছুঁড়ে বা পাথরের বল্লমে শিকার ভিন্ন আর কোনো কাজই যখন মানুষের জানা হয়নি, তখনও মানুষ ছবি আঁকতে জানতো ! পনর হাজার বছর আগে আঁকা বহু চিত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে দাক্ষিণাত্যে, বিন্ধ্য ও নীলগিরি পার্বত্যমালার বহু গুহাগাত্রে। বেলারী জেলার কাপ্‌গাল্লু গুহায় পাওয়া গেছে পাখী পশু মানুষের ছবি ; কালিকট থেকে প্রায় ৫৬ মাইল দূরে, উইনা আদ-এর এড্‌কাল গিরি গুহায় দেখা গেছে মানুষ এবং পশুর ছবি তার সঙ্গে স্বস্তিকা চিহ্নের মত চিহ্নও আঁকা দেখা যায় কয়েক জায়গায়, কতক-গুলো লোক নাচ্‌ছে, মুখোস আর মাথায় টোপোর আঁটা তাদের বোঝা যায় ; বোধহয় কোনো পূজা পার্বনের ব্যাপার ছবিতে আঁকা হয়েছিল। সিংভূম জেলার ঘাটশিলা সহরের কাছে মৌভাণ্ডার গাঁয়ে কতকগুলি পাথরের গায়ে খোদাই করা ছবি আবিষ্কৃত হয়েছে ; বিরাট আকারে আঁকা মানুষের ছবি, যেন কোনো বিশেষ এক উদ্দেশ্যে আঁকা হয়েছিল, এখন উদ্দেশ্য বোঝা যায় না কিন্তু দেখবার মত সে ছবির সহজ অথচ সবল রেখার ভঙ্গীগুলি। কাইমুর গিরিশ্রেণীর প্রায় বিশ মাইল স্থান জুড়ে বহু গুহাগাত্রে আরো অনেকগুলি ছবি দেখা যায়, সে সব ছবির বয়স পনর হাজার বছরেরও বেশি, হয়ত বিশ হাজারও হতে পারে ; মির্জাপুর জেলার ভালডারিয়া গুহায় বড় বড় শিংওয়ালা হরিণ শিকারের ছবি আঁকা হয়েছিল ; শিকারীর হাতে পাথরের বল্লম ; লোহরি গুহায় দেখা যায় বাঘের সঙ্গে মানুষের লড়ায়ের ছবি ; শোন নদের উপত্যকায় লিখুনিয়া পাহাড়ের গায়ে আছে এক শিকারী হরিণ শিকার করছে, ঘোড়ুমানগড় গুহায় গণ্ডার শিকারের ছবি, ছজন শিকারী ভীষণ ভাবে আক্রমণ করছে জন্তুটাকে, কেউ

গণ্ডারের শিংয়ের গুঁতোয় উলটে পড়েছে, কেউ পেছন থেকে ছুটে এসে বল্লম ছুঁড়ছে, একজনের মাথায় প্রকাণ্ড এক পালক গোঁজা সে বোধহয় সর্দার। এই রকমের গণ্ডার শিকারের ছবি আরো অনেক জায়গায় পাওয়া গেছে ; বুরহুরু পরগণার রোপ গ্রামের কাছে ; বিদজেইগড়ের কাছে হরিণহরণা গুহায় ; আরো অনেক গুহায়। আজকাল সে সব অঞ্চলে গণ্ডার দেখা যায় না, তবে পনর বিশ হাজার বছর আগে যে বিন্ধ্য আর নীলগিরির বনে গণ্ডারের আধিপত্য ছিল তার আরো প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিন্ধ্য পর্বতের বেলেপাথরের গায়ে লাল রঙে আঁকা ছবি বেশির ভাগই শিকার অভিযানের বর্ণনা। এছাড়া আরো নানান্ বিষয়ের বর্ণনা, সেই বন্যজীবন যাপনের যুগের মানুষের নানান্ কাজের আভাষ আমরা পাই বিশেষভাবে মধ্যপ্রদেশের রায়গড় রাজ্যের অন্তর্গত সিংহনপুর গ্রামের কাছে কতকগুলি পর্বতগুহায়। বি এন রেলওয়ের নাহারপালি নামে একটি ছোটো স্টেশনে থেকে এক ক্রোশ উত্তরে ঐ পর্বতগুহাগুলি ; ১৯১০ খৃঃ অব্দে সি. ডবল্‌উ. এণ্ডারসন নামে এক বিজ্ঞ রেলওয়ে অফিসার এই গুহার চিত্রগুলি আবিষ্কার করেন ; তার কয়েক বছর পরে সদলবলে তিনি এবং কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল পার্‌শি ব্রাউন্ সে ছবিকে বিশেষভাবে পরখ করতে যান ; ফিরে এসে পার্‌শি ব্রাউন্ যে প্রবন্ধ লেখেন সে সব ছবি সম্পর্কে তা থেকে জানা যায় যে, ছবি আঁকার জন্য বিশেষভাবে পাথরের গায়ে কিছু লেপে নেওয়া হত না ; স্বাভাবিক পাথরের গায়ে কঞ্চির আগা থেঁতো করে দাঁতনের মত তুলি দিয়ে লাল রংয়ের মোটা মোটা রেখা টেনে ছবি আঁকা হোতো ; সে লাল রং লোহার খোয়া থেকে বার করা হোতো ; রং কিসে গোলা হোতো তা বোঝা আজ আর যায় না তবে বোধহয় পশুর চর্বিতে গুলে তারপর ব্যবহার করা হোতো। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার গুহার সবচেয়ে অন্ধকার যে দিকটা সে দিকেই ছবি আঁকার ঝোঁক ছিল সেই অতি আদিম চিত্রশিল্পীদের ; শুধু তাই নয়, মানুষের নাগালের বাইরে অনেক উঁচুতেই বেশির ভাগ ছবি আঁকা হয়েছে ! শিকার অভিযানের বর্ণনা ত আছেই, আর আছে হিএরোগ্লিফিক্‌স্ বা চিত্র দিয়ে লেখা ভাষা, স্বতন্ত্র জীব জন্তু কুমীর প্রভৃতি। ছবিগুলির বেশির ভাগই এক রং দিয়ে আগাগোড়া ভরা, শিলুয়েট ; নাক মুখ চোখ নাই, শুধু পা থেকে মাথা অবধি দেহের একটা ভঙ্গি, এই ভঙ্গিমার রীতিতে বেশির ভাগ মানুষের ছবি আঁকা হয়েছে ; কোনো কোনো পশুর ছবিতে গায়ের চামড়ার রেখা, কোনো কোনো মানুষের গায়ে মইয়ের মত কতকগুলি দাঁড়ি টানা ; কিন্তু চোখ মুখ নাক কান নাই ; শিং বা পশুর কান আর সর্দারের মাথার টোপোর, শিকারীদের পরণে ঠেঁটি একটুকরো চামড়া, এসব বেশ স্পষ্ট ; মানুষগুলিকে বেশির ভাগই পেছন দিক থেকে দেখে আঁকা, পশুগুলি পাশ ফেরানো ; কুমীর বা গিরগিটির পিঠের দিক ওপর থেকে দেখে আঁকা।

'দেখে আঁকা' বল্‌লে ভুল বলা হয় এসব ছবিকে ; আদিম চিত্রকর কোনো কিছুই চোখের সামনে রেখে তা দেখে দেখে নকল করে আঁকে নি ; মনের থেকে, স্মরণ থেকে এঁকেছে। ছোটো ছেলেমেয়েরা যেমন মন থেকে যা কিছু আঁকে তা দেখে আসল বস্তুর

আভাষ পাওয়া যায় তবু আসল বস্তুর সঙ্গে সে ছবির হুবহু মিল পাওয়া যায় না, আদিম শিল্পীর ছবি—বিশেষভাবে ভারতবর্ষে—তেমনি আভাষমূলক ; এসব ছবিতে শিল্পীর মনের ছাপটাই সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে ; শিল্পী মানুষের ছবি আঁকবে বলেই মানুষের ছবি আঁকে নি, এঁকেছে মানুষের বীরত্বের ছবি, পশু শিকারে মানুষের কীরকম সংগ্রাম করতে হয়, সেই সংগ্রামের এক বর্ণনা ; সেই বর্ণনা দিতে গিয়ে মানুষকে আঁকতে হয়েছে বলেই যত সহজে পেরেছে মানুষের মত একটা আকার ভঙ্গীমার রীতিতে এঁকেছে ; যদি একা মানুষটার ওপর তার নজর থাকত, যদি তার সর্দারের চেহারাটা আঁকাই তার উদ্দেশ্য হোতো তবে সে তার চোখ মুখ আঁকার চেষ্টা করত, সে চেহারা নিখুঁত করে আঁকার দিকে নজর দিত ; এখানে নিখুঁত মানুষ আঁকার কোনো চেষ্টা নেই ; শিল্পীর মন এখানে শিকারীর ভীষণ সংগ্রামের কল্পনাতেই ব্যস্ত।

স্পেন আর ফ্রান্সের নানান গিরিগুহায় যে সব চিত্র বেশির ভাগই পশুচিত্র—দেখা যায় সে চিত্র ভারতবর্ষের গুহাচিত্রের তুলনায় হাজার গুণ নিখুঁত ; বাইসনের ছবি এঁকেছে আদিম স্পেনের চিত্রকর, দেখে মনে হয় জন্তুটাকে যেন চোখের সামনে জীবন্ত দেখছি ; সে ছবিতে চিত্রকরের নজর নিজের মনের দিকে নয়, মনের বাইরে জন্তুটার দিকে ; আসল বাইসনকে সে চিত্রকর তন্ন তন্ন করে দেখেছে তারপর এঁকেছে বাইসনের ছবি ; কিন্তু ভারতবর্ষের আদিম চিত্রকর গণ্ডার বা মানুষকে ভাসা ভাসা ভাবে দেখেছে, তার দেখার বস্তুগুলোর মধ্য থেকে সে পেয়েছে নিজের মনের মধ্যে যে সব ভাবের প্রেরণা, সেই প্রেরণার বশেই সে ছবি এঁকেছে।

কিন্তু তাই বলে ভারতবর্ষের আদিম শিল্পী যে স্পেন বা ফ্রান্সের আদিম শিল্পীর চেয়ে ছবি আঁকায় কাঁচা হাতের পরিচয় দিয়ে গেছে তা নয় ; তফাৎটা আঁকার ক্ষমতার নয় ; ভারতবর্ষের শিল্পীর ছবির ভঙ্গীর মধ্যে তুলি ধরার যে ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় ও দেশের আদিম শিল্পীর তুলনায় সে ক্ষমতা সমান ওস্তাদিরই পরিচয় দেয় ; তফাৎ শুধু দৃষ্টির, তফাৎ শুধু শিল্পীর মনের ; ভারতবর্ষের শিল্পী ছবি আঁকার সময়ে বাইরের বস্তু বিশেষের দিকে মন দেয় নি, মনের খেয়াল যা গেছে তাই এঁকেছে নিপুণ হাতে ; জাপানীদের ছবির মত এক আধটানে তার ভাব ফুটেছে ; অবিকল মানুষের মত' না হয়েও তার আঁকা মানুষের ছবি জীবন্ত, সুন্দর ; তার ছবি শুধু পশু বা মানুষের নিখুঁত ছবি নয়, শিকারের ছবি, ভীষণ সংগ্রামের ছবি, কোথাও বা নাচের ছবি, আনন্দে উল্লসিত মানুষের অনুভূতির ছবি ; স্পেন বা ফ্রান্সের আদিম শিল্পীর ছবি তা নয় ; সে ছবিতে জীবন্ত একটা পশুকেই শুধু হুবহু এঁকে রাখার চেষ্টা হয়েছে ; তুলির কসরতে ওস্তাদি, নিখুঁত কারিগরীর পরিচয় দিয়েছে তারা ; পশুর গায়ের চামড়ার প্রত্যেকটি ভাঁজ, এমন কি প্রত্যেকটি রোঁয়া পর্যন্ত স্পষ্ট করে তোলার চেষ্টা দেখি সে ছবিতে ; এখানে শিল্পীর নিপুণতার ওপর যত জোর দেওয়া হয়েছে, শিল্পীর খেয়ালের ওপর তত নয় ; ভারতবর্ষের আদিম শিল্পীর খেয়াল তার নিপুণতাকে ডিঙিয়ে গেছে, কষ্ট করে সবটা না এঁকেও সবটাকে বুঝিয়ে দিয়েছে আভাষে, ওদের

শিল্পীর ছবিতে তার খেয়ালের সেই আবেগের কোনো পরিচয় নেই।

নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন আজকাল আফ্রিকায়, অস্ট্রেলিয়ায় আর ভারতবর্ষে যাদের নিগ্রো, বুশম্যান, কোল, সাঁওতাল, হো জাতি বলে জানি তারাই পৃথিবীর আদিমতম শিল্পীদের বংশধর। এদের শিল্পকলা আজও সেই প্রাগৈতিহাসিক স্তর পার হয়ে বেশিদূর এগোতে পারে নি; কিন্তু নিগ্রো, বুশম্যান বা সাঁওতালরাই পৃথিবীর আদিমতম শিল্পীদের একমাত্র বংশধর নয়; সেই আদিম উৎসগুলির আরো অনেকগুলি ধারা পরবর্তী যুগের বড়ো বড়ো সভ্যতার মধ্যে উন্নততর শিল্পের ফসল ফলিয়েছে; ফ্রান্স ও স্পেনের আদিম শিল্পীদের মধ্যে একদলকে জানি আফ্রিকার অরণ্যবাসী নিগ্রো নামে, অন্য আরেক দল আফ্রিকার সেই দুর্গমে প্রবেশ না করে নীলনদের উপত্যকায় যে সভ্যতার মধ্যে আপনাদের শিল্প নৈপুণ্যকে নতুন এক রূপে বিকশিত করেছিল সে সভ্যতার নাম মিশরীয় সভ্যতা; মিশরের শিল্পী আদিম শিল্পীর বংশধর কিন্তু আদিম শিল্প পদ্ধতিকে সে নতুন এক পদ্ধতিতে পরিণত করে গেছে।

তেমনি ভারতবর্ষেও ঘটেছিল; অনেকে বিশ্বাস করেন, গুজরাট আর বাংলা দেশের মানুষের মধ্যে সেই আদিমতম ভারতবাসীর রক্ত, সভ্যতা, এমনকি শিল্পরীতি আজও বিদ্যমান্, তবে নানান পরিবর্তন ও বাইরের নানান্ প্রভাবে সে রক্ত, সে সভ্যতা, সে শিল্পরীতিকে আজ অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ভিন্ন বোঝা শক্ত। গুজরাট এবং বিশেষভাবে বাংলাদেশে আল্‌পনা নামে এক রীতির ছবি আঁকা আছে, সে রীতি সরাসরি আদিম শিল্পীর রীতি; এমন কি যে সব ব্রত বা পুণ্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে এই আল্‌পনা সংশ্লিষ্ট তা-ও আমরা উত্তরাধিকারী সূত্রে আদিমতম বন্যজাতির কাছ থেকে পেয়েছি; আর্য বা দ্রাবিড়ীরা বাঙ্গালী আর গুজরাটির পিতৃপুরুষ নন্; তাঁদের কাছ থেকে যা পেয়েছি তার সঙ্গে আমাদের আপন পিতৃপুরুষের দান আজও নিঃশেষে মিশিয়ে যায় নি; অন্ততঃ ছবি আঁকার বিদ্যা। ছোটোনাগপুরের হো জাতির সাঁওতাল আর সিংহলে বেদ্দা বাঙালীর আপন ভাই বলা চলে শিল্পী হিসাবে; আল্‌পনা যেমন মেয়েদের একচেটে বাংলায় আর গুজরাটে, হো, সাঁওতাল প্রভৃতিদের আল্‌পনার কাজ আর কুটিরগাত্রচিত্রন্ও তেমনি মেয়েদের নিজস্ব কাজ; এ ব্যাপার দেখে শুনে অনেক পণ্ডিত মনে করেন আদিম শিল্পীও হয়ত মেয়ে ছিলেন; হতেও পারে, নাও হতে পারে; আমার মনে হয় যে সব ব্রত আজ মেয়েরা করেন তা আদিমযুগে সমাজের সাধারণ ধর্ম ছিলো; অবশ্য আজকের ব্রতরূপটা সে ধর্মে ছিল না, থাকা সম্ভব নয়; নাচের কোনো কোনো ভঙ্গি, গানের কোনো কোনো ভাব, অনুষ্ঠানের কোনো কোনো আচরণ যেমনটি পনর হাজার বছর আগে ছিল এখন তেমনি আছে; আল্‌পনার কোনো কোনো নক্সা বিশেষ হয়ত সামান্য একটু অন্যভাবে ব্যবহৃত হোতো। এখন, সেই ধর্ম পুরুষ মহলে অচল হয়ে পড়তে লাগল ততই যতই সে মহলে বহির্জগতের প্রভাব আসতে লাগল, কিন্তু মেয়ে মহল পৌরুষের ক্ষেত্রের বাইরে থেকে নতুনকে গ্রহণ করার মতো বুদ্ধির অভাবে পুরানোকে আঁকড়ে রইল; ক্রমশঃ পুরুষের মধ্যে হয়ত শিল্পচর্চা নতুন রূপে দেখা দিল নয়ত

একেবারে বিদায় নিল।

আল্‌পনা আর ব্রত অনুষ্ঠানের উৎসের অন্য কোনো সন্ধান পাওয়া না যাওয়া পর্যন্ত ওপরের কথাগুলি মেনে নিতে আপত্তি নেই; বিশেষভাবে ভাষা, মানুষের মূর্তি, সামাজিক কোনো কোনো রীতি-নীতি যখন অনার্য নিষাদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা প্রমাণ করেছে তখন আল্‌পনাটাও যে তাদের কাছ থেকে পেয়েছি, ভাষা আর গায়ের রক্তের সঙ্গে সঙ্গে, তা স্বীকারে অগৌরবের কিছু নেই, গৌরবেরই বিশেষ কিছু আছে: আমরা অনার্য, তাই ভারতের ন্যায়সঙ্গত অধিকারী আমরাই; আর্য-দ্রাবিড় এরা উড়ে এসে জুড়ে বসেছে মাত্র।...

পুরাতত্ত্ববিজ্ঞানীদের মত এই যে, ছবি বস্তুটা আদিম মানবসমাজে ধর্মানুষ্ঠানের একটা বিশেষ অঙ্গ ছিল, মেঝেয় আল্‌পনা দেওয়াটা যেমন আজকালও তাই বলে গণ্য করা হয়। ছবিকে গিরি গুহার গভীরতম বা উচ্চতম প্রদেশে আঁকার কারণটা ঐ বলে মনে করেন তাঁরা, আর ভারতবর্ষের গুহাচিত্রগুলির বেশির ভাগই যদিও শিকারের, স্পেনের এবং ফ্রান্সের ছবিগুলি বেশির ভাগই একক পশুর বা পশুজীবনের স্বতন্ত্র ছবি। মানুষের সঙ্গে সেসব পশুর যেন কোনো সংস্রব নেই; যেখানেই মানুষের ছবি আঁকা হয়েছে সেখানে পশুকে বাদ দেওয়া হয়েছে; এ থেকে আরো স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে শিল্পীর ব্যক্তিগত মনের খেয়ালে না হয়ে সমাজের ধর্মবিশ্বাসের প্রেরণাতেই ঐ সব ছবি আঁকা হয়েছিল; এখনো আদিম নিষাদ জাতির বন্য বংশধরেরা ছবি আঁকাকে ধর্মানুষ্ঠান বলেই জানে এবং বিশেষ কয়েকটি বিষয় ভিন্ন অন্য কিছু তারা আঁকে না; সে বিষয়গুলি তাদের চিরাচরিত 'ধর্মশাস্ত্রে'র দ্বারা অনুমোদিত।

প্রাগৈতিহাসিক বর্বরের 'সভ্যতার' যা কিছু আজও আফ্রিকায় অবশিষ্ট আছে, জর্মান অজ্ঞাতদেশ-সন্ধানী ও নৃবিজ্ঞানী লিও ফ্রোবেঁইউস্‌ তা আজ সভ্য জগতের সামনে টেনে এনেছেন বহু শ্রম ও বহু দুঃখ সহ্য করে; তিনি ইউরোপে সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে 'যেসব বর্বর সভ্যতা' পৃথিবীতে মানুষের পরিচয়কে পশু পরিচয়ের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছিল, সেসব 'সংস্কৃতির মধ্যে সারবস্তু আর প্রাণসম্ভার নিশ্চয় প্রচুর ছিল। আর সেসব 'সংস্কৃতি'র যদি মৃত্যু না ঘটে থাকে তবে তারা স্থান পরিবর্তন করেছে, কারণ ইউরোপে তাদের কোনো চিহ্ন আর নেই।' তাঁর এই ধারণা অন্যান্য নৃবিজ্ঞানীদের থেকে ভিন্ন কারণ তাঁরা মনে করতেন, প্রাগৈতিহাসিক যুগের মৃত্যু ঘটে গেছে; আর সে যুগের শবের ওপর নূতন যুগ গড়ে উঠেছে! লিও ফ্রোবেঁইউস্‌ ক্রমশঃ প্রমাণ করলেন প্রাগৈতিহাসিক যুগ মরে নি শুধু ইউরোপ ছেড়ে গেছে আফ্রিকায়; তাদের এই যাওয়ার পথের চিহ্ন আবিষ্কার তিনিই করলেন সাহারা এ্যাটলাস আর লিবিয়ার মরুভূমে; এই দুই মরু সেই সুদূর যুগে অরণ্য ছিল। আজ আফ্রিকার সুদান প্রদেশে প্রাগৈতিহাসিক যুগের সভ্যতায় সভ্য নিষাদরা পাথরের গায়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের রীতিতে ছবি আঁকে। লিও ফ্রোবেঁইউস্‌ এমন সব মানুষ দেখে এসেছেন যারা শিকারে যে পশুকে বধ করার আশা করে ছুটেছিল (কিন্তু আশা পূর্ণ হয়

নি) সে পশুর ছবি বালির ওপর আঁকে তারপর তীর দিয়ে সে ছবিকে বিদ্ধ করে। আর এক জাতের মানুষ শিকারে নিহত পশুটাকে নিয়ে এমন সব কাণ্ড করে যার মানে হোলো পশুটাকে বুঝিয়ে দেওয়া যে সে সত্য সত্যই মরে নি ; কোথাও বা রক্তমাংসের পশুর অভাবে পশুর পুতুল গড়ে সে পুতুলের গায়ে একটা শুকনো চামড়া পরিয়ে দিয়ে ঐ 'বুঝ' দেওয়ার কাণ্ড সারা হয়। মূর্তিপূজা আর কার নাম ? ভাস্কর্যের গোড়া-পত্তনের খবরও কি এখানে পাওয়া গেল না ?

ভারতবর্ষের নীলগিরি পর্বত শ্রেণীর প্রাগৈতিহাসিক অনেক গুহায় মাটির তৈরি অনেক পশুর পুতুল পাওয়া গেছে ; আকারে খুবই ছোটো ছোটো হলেও, ওগুলি রচনার উদ্দেশ্য সুদানের পুজারীদের মতই বড়ো ; মনোভাব মূলত সব দেশেই এক, কারণ সব দেশেই মোটামুটি একই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষকে আপন জীবনকে গড়ে তুলতে হয়েছিল।

আফ্রিকায় হামুরাবি পর্বতশ্রেণীতে লিও ফ্রোবেঁইউস্ আর এক জাতের সন্ধান পেলেন যারা বিশেষ এক ধর্মানুষ্ঠানের সময়ে সোজা চলে যায় পাহাড়ের ওপর, গিয়ে লাল আর সাদা রং দিয়ে মানুষ পশু আর নানান্ তাবিজের ছবি এঁকে আসে ; সেসব ছবি 'শাস্ত্রীয়' অনুশাসনের রীতি মেনে আঁকা হয়, যেমন আমরা পুজোর ঘটের গায়ে শাস্ত্রীয় রীতিতে মানুষ আঁকি, স্বাস্তিকাচিহ্নের মতো গোটা কয়েক রেখা দিয়ে।

ভারতবর্ষের 'নিষাদ' সমাজে আজও ছবি আঁকা হয়ে থাকে কিন্তু তা তাদের ধর্মানুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ হিসাবে আঁকা হয় কিনা সে খবর এখনো সন্ধানে পাওয়া যায় নি ; কারণ তা পাওয়া সহজ নয় ; ভারতবর্ষের নিষাদেরা আফ্রিকানদের মতো বহির্জগতের সকল সংস্রব-বর্জিত-প্রদেশে আশ্রয় নিয়ে থাকতে পারে নি ; বাইরের প্রভাব এদেশের নিষাদের অন্তরে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছে যুগে যুগান্তে ; তবু তাদের ছবি আঁকার রীতিতে এখনো প্রাগৈতিহাসিক রীতির ছাপ বেশ স্পষ্ট আছে, এই শুধু আজ বলা চলে।

আরো এক কারণে প্রাগৈতিহাসিক যুগের সঙ্গে এ যুগের নিষাদদের সম্বন্ধ চাক্ষুষ পাওয়া দুষ্কর। গুহাজীবন, যেমন আফ্রিকায় আজও সম্ভব, ভারতে তেমন নয় ; গুহা ছেড়ে এদেশের নিষাদদের সমতলে কাঠখড়ের ঘর বাঁধতে হয়েছে বহু যুগ পূর্বেই ; আর সেই ঘর ভেঙে অবিরাম স্থান পরিবর্তন করে বেঁচে থাকতে হয়েছে—বাইরের থেকে নিরন্তর তাড়নায়, নিত্য নূতন জাতির অভ্যুদয়ে ছবি আঁকার ক্ষেত্র বারবার শত্রুপদমথিত হয়েছে ; আর সে ক্ষেত্রও অত্যন্ত সংকীর্ণ কারণ গাছের ডালপালা সাজিয়ে যে ঘর বাঁধা সে ঘরের দেওয়ালে ছবি আঁকা চলে না ; মাটি লেপে দেয়াল দেয়ার রীতি অনেক নিষাদ জাতির মধ্যে দেখা যায় ; তাদের রমণীরা সেই প্রাগৈতিহাসিক রীতিতেই আজও হাতির ছবি মানুষের ছবি মোটা সোটা ধ্যাবড়ানো রেখায় আঁকে ; কিন্তু মাটির দেয়ালের ছবি বর্ষার হাতে মুছে যায়। সুতরাং কি ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে কি দেশ-প্রকৃতির দিক দিয়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগকে এদেশে টিঁকিয়ে রাখা অসম্ভব ; জীবন-

পোষণের প্রধান উপায় যে পশু-শিকার তা ছেড়ে কৃষিকার্য অবলম্বন এদেশে যত শীঘ্র সম্ভব হয়েছিল তত শীঘ্রই এদেশের নিষাদের ধর্মশাস্ত্রেরও পরিবর্তন হয়েছিল। আফ্রিকায় বা অস্ট্রেলিয়ায় এমন কি ইউরোপেও তত শীঘ্র কোনো পরিবর্তন হয় নি। এদেশের প্রায় প্রত্যেক নিষাদ জাতি রাধাকৃষ্ণ, হরপার্বতী প্রভৃতি দেব-দেবীদের খবর জানে, সে জানার মধ্যে বুদ্ধির পরিচয় নেই; ভক্তির যোগও অতি অল্প; তাদের আপন ভক্তির পাত্র সর্দার বা পুরোহিত, আর ভাবনার পাত্র ভূতপ্রেত প্রভৃতি। ধর্মানুষ্ঠানগুলি তাদের হিন্দু এবং নিষাদ ধর্মের এক জগাখিচুড়ী; কাজেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ, এদেশে অনুসন্ধান করা আজ অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভব। শুধু বলা চলে, কৃষকের জীবন মুক্ত সমতল প্রদেশে হওয়ার জন্য পাহাড়ের সঙ্গে নিষাদের যোগসূত্র অতি দ্রুত ক্রমেই ছিন্ন হোলো; যা কিছু ধর্মানুষ্ঠান তা মাঠে মাঠে অনুষ্ঠিত হতে লাগল, ছবি আঁকাও সমতল ভূমিতে নেমে আসল; পরিণাম আলপনা।

সিংহনপুরের গুহাচিত্রে পশুতাড়নার যত ছবি দেখি তাতে একটা কথা খুবই স্পষ্ট: পশুর চেয়ে মানুষই সে চিত্রের চিত্রকরের কাছে বেশি পরিচিত; সে সকল চিত্রে পশুর চেয়ে মানুষ অনেক বেশি জীবন্ত; পশুর চিত্রগুলি কষ্টকল্পিত বলা চলে মানুষের তুলনায়; যে যুগে সে সব ছবি আঁকা হয়েছিল সে-যুগে পশুর সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ অনেক পরিমাণে সুদূর হয়ে পড়েছিল অনুমান করা শক্ত নয়; বোধহয় মৃতের শেষ-শয়ন ভিন্ন গুহার সঙ্গে নিষাদের অন্য যা কিছু বন্ধন তা শিথিল হয়ে এসেছিল যখন তখনই মৃতের সৎকারের আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান হিসাবে আঁকা হয়েছিল সে-সব ছবি; আগে হয়ত মৃতের সঙ্গে শিকারে নিহত পশুও সে গুহায় দেওয়া হোতো, পরে শিকারের অভাবে ঐ চিত্র দিয়ে মৃত আত্মার উদ্দেশে কর্তব্য করা হোতো। তাই পশুর চিত্রগুলিতে আড়ষ্ট গতানুগতিক রীতির ছাপ স্পষ্ট; পশু আঁকতে হয় বলেই আঁকা; মানুষের ছবির বেলায় ঐ বাধ্যবাধকতা থাকলেও মানুষ চিত্রকরের জীবনে ঘনিষ্ঠতর পশুর চেয়ে; কাজেই সে মানুষের ছবি আঁকতে গিয়ে অজ্ঞতার বাধা পায় নি, কল্পনাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পেরেছে মানুষের ছবিতেই; শুধু সিংহনপুর নয়, দক্ষিণভারতের বিভিন্ন আদিম নিষাদ চিত্রিত গুহাতে এই সত্যের প্রমাণ দেখা যায়; চিত্রের পশুগুলি প্রায় ক্ষেত্রেই একই আড়ষ্ট ভঙ্গিতে আঁকা কিন্তু মানুষের ছবি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভঙ্গিতে বিচিত্র ভাবের আধার করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে; হাতি বা গণ্ডারের ছবি প্রায় সর্বত্রই এক ধরণের পাশ ফেরানো ভঙ্গিতে একই প্রকারের রেখায় আঁকা, কিন্তু মানুষের ছবি কখনো পিছন থেকে কখনো পাশ থেকে, কখনো নাচের ভঙ্গিতে কখনো যুদ্ধের ভঙ্গিতে, কখনো দ্রুতগতির ভঙ্গিতে, কখনো বা পতনের ভঙ্গিতে, কখনো সে তাড়া করছে, কখনো বিতাড়িত হচ্ছে; কখনো আনন্দ কখনো ভয়, কখনো ক্রোধ; চিত্রকরের মনে ধর্ম বা লোকাচারের প্রেরণার চেয়ে আপন সৃষ্টির ইচ্ছা যে প্রবলভাবে কাজ করেছে তারই পরিচয় এসব মানুষের ছবিতে। সেই সৃষ্টির ইচ্ছার প্রাবল্য ইউরোপের আদিম নিষাদের চিত্রে অনুভূত হয় অন্য একদিকে। অসাধারণ পরিশ্রম করে আঁকা ইউরোপের গুহাচিত্রগুলিতে সাধনার পরিচয় পাই, আলটামিরার গুহায়

বাইসনের ছবিতে। সিংহনপুরের চিত্রকরের সেই পরিশ্রম স্বীকার দেখি না ; তার প্রবল সৃষ্টির ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে ছবি আঁকার উৎসাহের মধ্যে ; ছবিগুলি এলোমেলো ভাবে পাথরের গায়ে ছড়ানো ; ছোটো ছেলেরা যেমন দেয়ালে পেন্‌সিল্‌ ঘষে ছবি আঁকে যেখানে তার যেটা খুশি, মস্ত দেয়ালে ছবি আঁকার মস্ত ক্ষেত্রটা নিয়ে তার মন যেমন যেখানে সেখানে ছুটে বেড়ানোরই পরিচয় দেয় যেখানে সেখানে আঁকায়, দেয়াল ছাড়িয়ে জানলায় দরজায় থামের গায়ে মেঝেতে কোথাও তার পেন্‌সিলের গতি বাধা মানে না, তেমনি ঐ আদিম চিত্রকরের 'দাঁতন'ও যেন সব বাধা পার হয়ে ছুটেছে গুহার গায়ের ওপর ; তার ছবিতে ধারাবাহিক কিছু নেই, নেই থামবার সীমা, নেই আরম্ভের ঠিকানা ; ধর্মশাস্ত্রের বিধান তাকে গুহার আলোকিত দিকে কিংবা নীচে নামতে বাধা দিয়েছে কিন্তু তা পারেনি সর্বত্র বাধা মানিয়ে রাখতে। সৃষ্টিতে তার অদম্য আনন্দের পরিচয় ঐ অর্ধ -সমাপ্ত ছবিগুলিতেই স্পষ্ট হয়েছে ; সাধনার দুঃখ স্বীকার নেই ; মনের ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ পেল কি না একথা অন্য কারো মুখে শোনার অপেক্ষা না রেখেই সে চিত্রকর ছবিটা থেকে তুলি তুলে নিয়েছে।

ভারতীয় আদিম চিত্রকরের ছবি থেকে আমরা তার যে মনোভাবের পরিচয় পাই তা সম্পূর্ণভাবেই শিশুর স্বাধীন সতেজ স্বানন্দ মনেরই অনুরূপ ; তাই ভারতীয় নিষাদ চিত্রে আমরা চিত্রকরকে যত স্পষ্টরূপে দেখি চিত্রিত বস্তুকে তত নয়।*

□

* এই রচনাটির তারিখ লেখেননি চিত্ত প্রসাদ।